শিশুশিক্ষার পাসওয়ার্ডগুলো

[Borendra Lal Tripura](https://www.facebook.com/borendra.l.tripura)·[Sunday, November 26, 2017](https://www.facebook.com/notes/borendra-lal-tripura/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B/10155232763482239/)

বরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গায়ত্রী ত্রিপুরা

পাসওয়ার্ডের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা জানি; বিশেষ করে যারা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, তাদের জন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার অপরিহার্য। আপনি মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ব্যবহার করছেন,ই-মেইল, ফেইসবুক, টুইটার বা যে কোন মিডিয়াতে একাউন্ট খুলেছেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। তাই পাসওয়ার্ড মনে রাখা এবং অ্যাকাউন্ট- এ প্রবেশ করার জন্যে সঠিকভাবে পাসওয়ার্ড এন্ট্রি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাসওয়ার্ডের ভুল হলে কি ভোগান্তির শিকার হতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত রয়েছেন। বলা হয় যে, ধর্মীয় শ্লোকগুলোও পাসওয়ার্ডের মতই যা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন ডোমেইন এ আমরা প্রবেশ করতে পারি। ধর্মীয় শ্লোক বা মন্ত্রের ভুল উচ্চারণ তাই পাসওয়ার্ড বিভ্রাটের মতো একাউণ্টে প্রবেশের ব্যর্থতা ডেকে আনতে পারে। সামরিক বাহিনীর কোন দল নাকি সেনানিবাসের বা ব্যারাকের বাইরে গেলে একটা পাসওয়ার্ড নিয়ে যায়। ফিরে আসার সময় তাদেরকে ব্যারাকে প্রবেশের জন্যে অবশ্যই ওই পাসওয়ার্ড বলতে হবে। পাস্ওয়ার্ডে ভুল হলে সেখানে প্রান সংহারি গুলাগুলিও হতে পারে। তাই সঠিক পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সঠিক পদ্ধতি, আচরণ এবং উপকরণ ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- শিশুর যথাযথ বিকাশ এবং সাফল্যের জন্য, যেটাকে এই নিবন্ধে আমরা পাসওয়ার্ড হিসেবে রেফার করবো। এই নিবন্ধে আমরা শিশু শিক্ষার বিভিন্ন দিক, বিশেষতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য, মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও সংবেদনশীলতা, পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের করনীয়- কল্পনা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, আত্মবিশ্বাসের নির্মাণ ও বুনন, এক্টিভিটি ও বিরতি, বিষয়বস্তুর পরম্পরা ও ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা উপকরণ, পুরষ্কার ও শাস্তি, এবং প্রশাসক ও নীতিনির্ধারকদের করনীয় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস গ্রহন করবো।

**মানব মস্তিষ্কের ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা ও সুপার কম্পিউটার**

বলা হয় যে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক একটি সুপার কম্পিউটারের থেকে দশকোটি গুন বেশি শক্তিশালী ও জটিল। এমন শক্তিশালী, জটিল ও সংবেদনশীল একটি মেশিনকে চালনা করার জন্য প্রয়োজন সেইরূপ জ্ঞান ও সংবেদনশীলতা। জবরদস্তি ও হাতুড়ি পেটা দিয়ে এটাকে চালানো মোটেও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, সঠিক কমান্ড দিয়ে যদি এটাকে চালনা করা যায় তাহলে অমিত কাজের সমাধান করা সম্ভব। বলা হয় যে মানব মস্তিষ্ককে যত শান্ত রাখা যায় তত বেশি \তা সক্ষমতা অর্জন করে। একটা শান্ত পুকুরের জলে এক বিন্দু বালিকনাও যদি নিক্ষেপ করা হয় তাহলে পুকুর তা টের পেয়ে যায়; কিন্ত অশান্ত জলে অসংখ্য ঢিল ছুঁড়লেও পুকুর তা বুঝতে পারেনা। একারনেই বিজ্ঞানী নিউটন - আর্কিমিডিস এমন শান্ত-সুস্থির অবস্থাতেই তাদের সেরা উপলব্ধিগুলো করতে পেরেছিলেন। তাই শিশুদের বোধ ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য তার মন ও মস্তিষ্কককে শান্ত রাখতে হবে। অযথা বকা-ঝকা, হুমকি-ধমকি, মার-ধর করে তার মন এবং মস্তিষ্ককে অশান্ত করা অনুচিত।

**শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাসওয়ার্ডের প্রয়োগ- অপপ্রয়োগ**

শিশুর মনের আকাশে তারার উল্কি এঁকে দেয়াই হচ্ছে শিশু শিক্ষার প্রাথমিক কর্তব্য এবং তাকে সেই তারা হয়ে উঠার জন্য সাহায্য করাই শিক্ষার চুড়ান্ত কাজ। যার মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তাকে বিকশিত করাই শিক্ষার মুল উদ্দেশ্য। সে সুপ্ত প্রতিভা হতে পারে জিনগতভাবে প্রাপ্ত অথবা পরিবেশগতভাবে অনুপ্রানিত।অমিত সম্ভাবনাময় নিঃসীম আকাশে কোন তারা সে হতে চায়, সে তারার ছবি যেন সে কল্পনা করে, আঁকে, নানান রঙ্গে সাজায় তার জন্য নিরন্তর তাকে উৎসাহ, অনুপ্রেরনা, সাহস- সমর্থন ও আত্মবিশ্বাসের জোগান দিয়ে যেতে হবে। আমরা যখন শিশুশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করি, সেই পাসওয়ার্ডগুলোর দিকেই দৃষ্টিপাত করি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় সেই পাসওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারনার অভাবে বা প্রশিক্ষণের অভাবে অথবা আত্মসংযমের অভাবে আমরা ভুল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ফেলি; বিশেষতঃ জবরদস্তিমূলকভাবে শিশুর মেধার চেম্বার-এ প্রবেশ করতে যেয়ে তার মেধার বিকাশের পরিবর্তে বরঞ্চ আমরা তার মুকুলিত বা সুপ্ত প্রতিভার ফাইল্গুলোকেই ধ্বংস করে ফেলি। তাই শিক্ষার সাথে জড়িতদের প্রথম থেকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাসওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে জেনে রাখা আবশ্যক। এগুলো যদি জানা নাও থাকে- দু’টি বিষয় অবশ্যই জানতে হবে- তাহলো ভালোবাসা এবং ধৈর্য। এই দু’টি গুনাবলি থাকলে আপাতত কোন ক্ষতি নাকরেই শিশুর শিক্ষা কিছুটা এগিয়ে নেওয়া যায়। অন্যথায় উদ্দেশ্যবিহীন ও ভুল পাসওয়ার্ডের ব্যবহারে আমরা শিশুদের সম্ভাবনাময় প্রতিভার বিকাশে সহায়তার পরিবর্তে তাদের প্রতিভাকেই বিনাশ করে ফেলবো।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা ভেবে থাকি যে দৈনন্দিন পড়া সম্পন্ন করা, গাদাগাদা হোম ওয়ার্ক করা, সিলেবাস সম্পূর্ণ করা এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করাই হচ্ছে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম মাত্র; প্রকৃত লক্ষ্য নয়। তথাপিও এগুলোকেই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ধরা হয়- তা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতি। অনেক সময় দেখা যায় উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিশুদের উপর জবরদস্তিমুলকভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়, রাগ-ক্ষোভ দেখানো হয়, দুরব্যবহার, অপমান-অপদস্ত করা হয়; এমনকি মার-ধর করে নাকের পানি-চোখের পানি ঝরানো হয়। এর ফলে শিশুদের মনে তৈরি হতে পারে শিক্ষাভীতি ও অনীহা যা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনতে পারে। তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ত আমরা হোম-ওয়ার্কটা আদায় করে নিতে পারি, সেইদিনের পড়া সম্পন্ন করিয়ে নিতে পেরে আত্মতৃপ্তি পেতে পারি; কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি ফল হিসেবে শিশুর মানসিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে;লেখাপড়ার প্রতি ভালোবাসা নষ্ট হয়ে জন্ম নিতে পারে রাগ-ক্ষোভ-ঘৃনা-ভীতি ও অনীহা। শিশুর ভেতর যদি শিক্ষাভীতি ও অনীহা তৈরি হয় তাহলে তার মনে ও প্রচেষ্টায় সুদূর প্রসারি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে- তার ভেতরের ড্রাইভিংফোর্স বা চালিকা শক্তি অকেজো হয়ে যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে শিশু আর পড়াশোনায় বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার পথে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাহলে কী লাভ জবরদস্তি করে শিশুর কাছ থেকে পড়া আদায় করে!

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাসওয়ার্ড সম্পর্কে জানা থাকলে এই ভ্রান্তি আমাদের দূর হবে। একজন মানব শিশু জন্ম গ্রহন করে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে। সে সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে তাকে বিকশিত হওয়ার জন্য পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করাই আমাদের আসল দায়িত্ব- শিক্ষক হিসেবে, পিতা-মাতা হিসেবে, প্রশাসক হিসেবে এবং নীতিনির্ধারক হিসেবে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা যেসব ফলপ্রসূ পন্থা অবলম্বন করবো সেগুলোই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পাসওয়ার্ড। এখানে আমরা আমাদের করনীয় হিসেবে বেশ কিছু দিক বা পাস ওয়ার্ড নিয়ে আলোকপাত করতে চাইঃ

**(এক) কল্পনা ও সুপ্ত প্রতিভার জাগরণঃ**

একজন মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করে অমিত প্রতিভা এবং সম্ভাবনা নিয়ে। সেই সম্ভাবনা থাকে শিশুর ভেতর সুপ্ত আকারে। তাকে জাগিয়ে তোলা এবং যথার্থভাবে বেড়ে উঠার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করাই হচ্ছে পিতা-মাতা এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের কাজ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় হচ্ছে শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশ করা, আত্মবিশ্বাসের বুনন এবং পরিবীক্ষণ (এক্সপোজার)। শিশুর কল্পনা শক্তি বাড়ানোর জন্য তাকে প্রচুর গল্প, কবিতা, গান শুনাতে হবে, ছবি অংকন করাতে হবে, ছবি এবং কার্টুন দেখাতে হবে। এগুলোর মাধ্যমে তার মানষপটে অঙ্কিত হবে নানান কল্পনা, গল্প ও কাহিনী। উৎসাহ দিতে হবে গল্প লিখতে, গল্প বলতে, ছবি আঁকতে। একই সাথে শিশুদের বিভিন্ন পরিবেশ,আয়োজন,উৎসব-অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া উচিত; এতে করে তার পরিবীক্ষন বেড়ে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের নিউরন কোষ বৃদ্ধি পাবে; সাথে সাথে কল্পনা শক্তিও বেড়ে যাবে। শিশুর কল্পনা শক্তি বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সে তার নিজের জীবনে উক্ত কল্পনার প্রতিফলন ঘটাতে চাইবে- বিভিন্ন খেলার ছলে।মেলায় গিয়ে, বেড়াতে গিয়ে, অনুষ্ঠানে যেয়ে সে যা দেখে এসেছে তা করতে চাইবে তার জীবনেও। তাকে সে খেলাগুলো খেলতে দিতে হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ব্যাপারে করনীয় সম্পর্কে পরবর্তী অংশে আলোচনা করবো। আমরা জানি যে প্রতিভার স্বীকৃতি প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। তাই তার প্রতিটি ভালো কাজের স্বীকৃতি দিয়ে এবং প্রশংসা করে তাকে উৎসাহিত করা উচিত। তবেই প্রস্ফুটিত হতে পারে শিশুর মনের আকাশে অঙ্কিত তারার উল্কিটি অথবা জেগে উঠতে পারে তার ভেতরে শায়িত-সুপ্ত মহান প্রতিভাটি যা হতে পারে একজন বিজ্ঞানী,অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, নর্তক,যাদুকর, চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা, খেলোয়াড়, রন্ধনশিল্পী,প্রযুক্তিবিদ, ভাস্কর, রাজনীতিবিদ বা যেকোনো কিছু। আমাদের মনে রাখা উচিত যে পৃথিবীতে মহান বা তুচ্ছ বলে কিছু নেই। সবকিছুই মহান এবং তুচ্ছ হতে পারে। যার ভেতর যে প্রতিভা আছে তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে যদি সেই বিষয়ে চরম উৎকর্ষতা অর্জন করা যায় তাহলে সে বিষয়েই আমরা মহান।

**(দুই) আত্মবিশ্বাসের নির্মাণ ও বুননঃ**

শিশুর সাফল্য অর্জন এবং লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মূলধন হচ্ছে তার আত্মবিশ্বাস। কাজেই পিতামাতা আর শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুদের মনে আত্মবিশ্বাসের বুনন বা নির্মাণ করে দেয়া। বলতে হবে, “বাহ তুমিতো পারছো, চমৎকার এঁকেছো, চমৎকার রং করেছো, খুবই সুন্দর হয়েছে, তুমি পারবে, তোমাকে দিয়ে হবে, তোমাকে দিয়েই হবে, কারণ তুমি মেধাবী, চেষ্টা করে যাও, চেষ্টা করলে আরও ভালো হবে” ইত্যাদি। তাছাড়া সময়ে সময়ে শিশুদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দিয়ে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দেয়া উচিত।

অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক আছেন যারা শিশুদের হোমওয়ার্ক, লেসন করানোর সময় বকাঝকা, হুমকি- ধমকি এমনকি মারধর করে শিশুর মনে আতংক ও ভীতির সঞ্চার করে থাকে এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ আদায় করে অর্থাৎ হোম ওয়ার্ক বা পড়া আদায় করে থাকে; বিনিময়ে শিশুর সুদুরপ্রসারি এবং মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকেন। এতে করে শিশুরা পড়ালেখাকে ভয়ংকর ব্যাপার হিসেবে গণ্য করতে পারে; লেখাপড়ার প্রতি বিরাগ, ঘৃণা, অনীহা তৈরি হতে পারে। তাদের মানসিক বিকাশ, মেধার বিকাশ, ব্রেইন ডেভেলাপমেন্ট থেমে যেতে পারে।

কোন বিষয়ের প্রতি যদি আপনার ভয়- ভীতি, ঘৃণা, অনীহা থাকে আপনি কি সেই বিষয়ে সফল হতে পারবেন? পারবেন না। তাই শিশুর আত্মবিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কোন কিছুর জন্যে সেটা নষ্ট করা যাবে না এবং সেটা ধরে রাখার জন্যে প্রয়োজনে সেই দিনের হোমওয়ার্ক, লেসন বিসর্জন দিতে হবে।

**(তিন) শিক্ষা উপকরণ:**

শিক্ষার উপকরণ তৈরি করার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিত সেগুলো হল তাদের বয়স, প্রেক্ষাপট, জ্ঞানের স্তর, আগ্রহ, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমটা, আর্থ-সামাজিক বাস্তবটা ইত্যাদি। আদর্শগতভাবে বলা যায় যে, শিশুরা রঙ্গিন উপকরণের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়; তাই তাদের শিক্ষা উপকরণগুলোও রঙ্গিন হওয়াই বাঞ্চণীয়। শিশুরা কথার চেয়ে ছবির ভাষা বেশি বুঝতে পারে। সুতরাং, তাদের বাস্তব এবং জীবন্ত বস্তুর প্রদর্শনীর পাশাপাশি ছবিতে পরিপূর্ণ বইপত্র দেওয়া হলে সেই বইপত্রের প্রতি বেশি আগ্রহী হবে এবং সেই বইয়ের ভাষা বেশি বুঝতে পারবে। বিষয়বস্তুগুলো যদি শিশুর প্রেক্ষাপট নির্ভর হয় তাহলে তা সহজে শিশুদের হৃদয়ঙ্গম হবে, অর্থাৎ বাংলাদেশি শিশুদের জন্য বইপত্র হবে বাংলাদেশ, বাঙ্গালী সংস্কৃতি, বাংলাভাষা নির্ভর।

বাংলাদেশিদের মধ্যেও আদিবাসী শিশুদের জন্যে তাদের পাঠ্য উপকরণে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ- পরিস্থিতির বিশেষ স্থান থাকা আবশ্যক। সাধারণত ইতিবাচক এবং সাফল্যের গল্প দিয়েই বিষয়বস্তুগুলো গ্রন্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**(চার) এক্টিভিটি ও ব্রেকঃ**

হোম ওয়ার্ক বা পড়া হচ্ছে একটিভিটির অংশমাত্র, যেটা শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায় মাত্র। এরূপ আরও অসংখ্য একটিভিটি থাকতে পারে যা শিশুকে সাহায্য করবে এই পৃথিবীকে বোঝার, জীবনকে বোঝার, পরিপার্শ্বকে বোঝার, সমাজ- সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিজ্ঞানকে বোঝার, তাদের জীবন দক্ষতা বাড়ানোর। এক্টিভিটি যেটাই হোক- উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ। প্রত্যেক একটিভিটিই হচ্ছে শিশুর বিকাশের মাধ্যম মাত্র আর তার চালিকা শক্তি হচ্ছে আত্ববিশ্বাস, উৎসাহ, অণুপ্রেরণা, ভালোবাসা, সমর্থন ও সহযোগিতা। হুমকি-ধ্মকি, অপমান- আঘাত কিছুতেই নয়। শিশুদের জন্য এক্টিভিটিগুলো হতে পারে – লেখা, পড়া, দেখা, অংশগ্রহণ করা, আঁকা, রং করা, খেলা, নাচা, গাওয়া, বাজানো, বানানো, বেড়ানো, সাতাঁর কাটা, উপস্থাপন করা, আলোচনা, বিতর্ক করা ইত্যাদি। উন্নত দেশগুলোতে লেখাপড়ার চেয়ে অন্যান্য এক্টিভিটগুলোইকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ অন্যান্য এক্টিভিটিগুলোই শিশুদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য যা তাদের আনন্দ, অনুরাগ, আত্মবিশ্বাস এবং জীবন দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে। অথচ আমাদের দেশে লেখাপড়াকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্টিভিট যাই হোকনা কেন, মা-বাবা এবং শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে যে তাদের কাজ হচ্ছে শিশুদের গাইড করা, সহযোগিতা করা, সাহস দেওয়া, অনুপ্রাণিত করা, প্রশংসা করা ও পুরষ্কার দেওয়া। যখনই এই পাসওয়ার্ডগুলোর অভাব দেখা দিবে- নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আপাতত বিরত রাখতে হবে, ব্রেক নিতে হবে। ব্রেক নেওয়ার মাধ্যমে যদি উভয়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ধৈর্য ও প্রেরণা ফিরে আসে, তাহলে আবার শুরু করা যেতে পারে। এখানে ধর্তব্য যে, শিশুদের ধৈর্য ও মনোযোগ বড়দের সমকক্ষ নয়। তাই, শিশুদের যদি টানা কয়েক ঘণ্টা খাটিয়ে লেসন শেষ করে ফেলতে চান তাহলে আপনি এবং আপনার শিশু দুইজনেই দিশেহারা হয়ে পরবেন এবং রুঢ় আচরণ শুরু করবেন। সুতরাং,আপনার শিশুকে ব্রেক দিন এবং আপনিও ব্রেক নিন।

**(পাঁচ) বিষয়বস্তুর পরম্পরা ও ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জঃ ছোট থেকে বড়-চেনা থেকে অচেনা**

শিশুর লেখাপড়া এবং এক্টিভিটগুলোই হতে হবে তাদের বয়সের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তাদের জ্ঞানের স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারনত ছোট ছোট ও আনন্দদায়ক পড়া ও এক্টিভিটি দিয়েই তাদের শিক্ষণটা শুরু হওয়া উচিত যেন শিশুরা সহজেই তা বুঝতে পারে, করতে পারে এবং সমাধান করতে পারে। প্রতিটি কর্মকাণ্ডের পর পরই বাহবা ও পুরস্কার দিতে হবে। সেগুলো হতে পারে প্রশংসাসুচক শব্দ, বাক্য বা সিম্বল, যেমন খাতায় বা বোর্ডে স্টার আঁকা,রকেট আঁকা, মার্কস দেওয়া ইত্যাদি। এতে করে শিশুরা আত্মবিশ্বাস, আনন্দ ও প্রেরনা লাভ করবে।

তাদের কর্মকাণ্ড হবে পর্যায়ক্রমিকভাবে কঠিন তর, দীর্ঘতর, জটিলতর আর চ্যালেঞ্জিং। তাদের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুদের বিকাশের স্তর সম্পর্কে আমাদের ধারনা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সুইস মনোবিজ্ঞানি জ্যাঁ পিঁয়াজের (Jean Piaget) শিশুদের বৃদ্ধি সম্পর্কিত তত্ব- STAGES OF DEVELOPMENT- অত্যন্ত সহায়ক।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল বিষয়বস্তু। আমরা সাধারণত যাত্রা শুরু করি চেনা থেকে অচেনা জগতের পথে এবং নিকট থেকে দূরে। শিশুদের চেনা জগতের মধ্যে রয়েছে তার ভাষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ-পরিপার্শ্ব, পরিচিত মানুষ ও পশুপাখিদের কর্মকাণ্ড। সুতরাং, শিশুদের বই পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলোও হওয়া উচিত এগুলোকে ঘিরেই। তাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিষয়বস্তুও পরিবর্তিতও হবে অচেনা আর দূরের বিষয় - আশয়তে।

**(ছয়) পুরষ্কার ও শাস্তি**

প্রতিভার স্বীকৃতি প্রতিভার বিকাশ ঘটায় এই কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিহেবিয়ারিজম তত্বে (Behaviourism Theory) এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে পুরষ্কার (Reward) মানুষের ইতিবাচক আচরণকে বাড়িয়ে তোলে এবং তিরস্কার (Punishment) মানুষের নেতিবাচক আচরণকে সংকুচিত করে। তাই শিশুদের ভালো আচরণ, প্রচেষ্টা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উপস্থাপনা ও পরিবেশনাকে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত করা বাঞ্জনীয়। দৈনন্দিন ক্ষেত্রে মৌখিক ও সিম্বোলিক পুরস্কারের ব্যাপারটাই বেশি প্রযোজ্য, যেমন প্রশংসাসূচক ও প্রেরণাদায়ক শব্দ, বাক্য ও চিহ্নের ব্যবহার (খাতায় স্টার, স্মাইলি, রকেট এঁকে দেয়া ইত্যাদি)। আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট, মেডেল, অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হলে শিশুরা প্রচন্ডভাবে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত হবে।

বিপরীতে শিশুদের নেতিবাচক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাটা অত্যন্ত ডেলিকেট ও সংবেদনশীল বিষয়। মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণ বা শাস্তি যেন কোনভাবেই শিশুদের বিকাশকে নষ্ট না করে; কোনভাবেই যেন আতঙ্ক, ভীতি ও অনীহার সঞ্চার না করে। যতদূর সম্ভব ধৈর্য-সহনশীলতারসাথে যৌক্তিকভাবে শিশুদের নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তি প্রদান করতে হবে। তাদের শাস্তিগুলো হতে পারে তাদেরকে পরিণাম সম্পর্কে বোঝানো, যেমন বলে দেয়া যে এমন আচরণ করলে “তোমাকে আর স্টার চিহ্ন দেবনা, রকেট ও প্রজাপতি সিম্বল দেবনা, তুমি আর চকলেট এবং সার্টিফিকেট পাবেনা, তোমাকে আর তোমার প্রিয় খাবার বানিয়ে খাওয়াবনা, বেড়াতে নিয়ে যাবনা; এমনটা করতে থাকলে লোকে তোমাকে পচা বলবে, দুষ্ট বলবে, গুড বয় বা গুড গার্ল বলবেনা, ভালোবাসবেনা; এগুলো করলে আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাবো, দুঃখ পাবো” ইত্যাদি। সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে মাথায় হাত রেখে ক্লাসের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা। তবে এটা করতে হবে খুবই বিরলভাবে; দৈনন্দিনভাবে এই শাস্তি দেওয়া হলে এটার এফেক্ট নষ্ট হয়ে যাবে। কোন কিছুতেই যদি কিছু না হয় তবে অভিভাবকের সাথে আলোচনা হতে পারে, টিসি দেয়া যেতে পারে; তবে মার-ধর কিছুতেই করা সমীচীন নয়।

**(সাত) প্রশাসক ও নীতিনির্ধারকদের করনীয়**

এটা বলা বাহুল্য যে নীতিনির্ধারক ও প্রশাসকদের করনীয় হচ্ছে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনিক, আর্থিক, লজিস্টিক, অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান, উপযুক্ত জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পাঠ্য উপকরণ সরবরাহ, গবেষনা ও উন্নয়ন এবং মনিটরিং করা ইত্যাদি। এই বিষয় যদিও সবাই জানে তবু আমি এখানে বিষয়টির অবতারণা করলাম এই কারণে যে বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষার ক্ষেত্র নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনেক অসন্তোষ বিরাজমান রয়েছে নীতিনির্ধারকদের প্রতি। তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই অংশটুকুর উল্লেখ। দেশ ও জাতি গঠনের জন্য প্রধান যে স্তম্ভ তথা শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা বা জন অসন্তোষ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড থাকা উচিত নয়।

উপসংহারে এটা বলা যায় যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর মধ্যে বিরাজমান সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ এবং পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। এই উদ্দেশ্য পূরন করার নিমিত্তে শিশুদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও এক্টিভিটি সৃষ্টি করা জরুরী এবং সে এক্টিভিটি সম্পাদনের জন্য শিশুদেরকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা, সমর্থন ও পথ প্রদর্শন করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হলে সে আত্মবিশ্বাস এবং শিক্ষার প্রতি ভালোবাসাকে বিনষ্ট না করেই দিতে হবে। শিশুদের শিক্ষা উপকরণ হওয়া উচিত শিশু বান্ধব। শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসক এবং নীতিনির্ধারক সবার প্রচেষ্টাই পারবে শিক্ষা-দীক্ষায় শিশুদের সাফল্য এনে দিতে যা দেশ এবং জাতির সাফল্যের জন্য অনিবার্য।

...........................................................................................................................................................বরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা-সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটি- বাংলাদেশ। গায়ত্রী ত্রিপুরা-এম. এড. শিক্ষার্থী, আই. ই.আর., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়